International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-II, March 2022, Page No. 42-48
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i2.2022.26-34

গোত্রান্তর : উদ্বাস্তু মানুষের গোত্রান্তরের এক দলিল

সঞ্জয় মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In 1947, India became independent through the partition of two states, India and Pakistan, on the basis of biracial theory. Even after the independence of the country, millions of innocent people who became a minority in both Bengalis could not stay in the house of their fathers and grandfathers and accompanied them on a dark path. In the post-independence and post-partition period, the biggest problem of the displaced people was the problem of housing and livelihood. The society of refugee people from East Bengal could no longer maintain its familiar appearance. All the abandoned people often took the life of a laborer as they could not find a decent scholarship. Disgust arose in their perception of unaccustomed hard work, and the need for group and classification awoke in their minds to be constantly exploited. Bijan Bhattacharya's play 'Gotantar' is based on the life and livelihood of the refugees created as a result of partition. In the discussion of Bijan Bhattacharya's play 'Gotrantar' in the main article 'Gotrantar: Udbastu Manuser Gotrantorer Eak Dalil', I tried to show how Harendra, a refugee school teacher and his family migrated from a decent middle class life to a tribal slum.

Key-Word: Independent, Biracial Theory, Livelihood, Abandoned, Unaccustomed, Refugee

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভারত-পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র ভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়। দেশভাগ বাঙালি সুস্থিত জীবনধারাকে অস্থির করে তুলেছিল। উভয় বাংলায় যারা সংখ্যালঘু হল, সেই লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ তারা তাদের বাপ-পিতামহের ভিটায় থাকতে না পেরে পথে নামল এক অন্ধকারকে সঙ্গী করে। দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ শুধু মাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়। এটি একই সঙ্গে প্রভাবিত করেছিল অর্থনীতি এবং সমাজকে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষজন সমাজ, তার পরিচিত চেহারা আর বজায় রাখতে পারল না। পূর্ববঙ্গ থেকে সব ফেলে আসা মানুষজন অনেক সময়ই সম্মানজনক বৃত্তি আশ্রয় করতে না পেরে শ্রমজীবীর জীবন গ্রহণ করেছিল। অনভ্যস্ত কঠোর পরিশ্রমে তাদের উপলব্ধিতে জেগেছিল বিতৃষ্ণা, আর নিত্য শোষিত হতে হতে মননে জেগেছিল গোষ্ঠী তথা শ্রেণিবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা। বিগত শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া এই দেশভাগ এক মানবিক বিপর্যয়, সাহিত্য মানুষের বিচিত্র

অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ। আবার সাহিত্যের মধ্যে নাটক সমকালের সংকট, সংঘাত, সংগ্রামকে তীব্রভাবে ধরে রাখে। এই দেশভাগকে বিষয়বস্তু করে রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' নাটকটি। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালের শারদীয় বসুমতী পত্রিকায় এবং প্রথম অভিনীত হয় ১৯৫৯ সালের ১৬ই আগস্ট নিউ এম্পিয়ার মঞ্চে, ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজনায়। একজন উদ্বাস্তু স্কুল শিক্ষক সপরিবারে কীভাবে ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে বস্তিবাসী শ্রমিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ল তারই কাহিনী নাটকে বর্ণিত। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন--

> "নীতিবাদের প্রশ্ন নয় -- জীবনের ক্ষেত্রেই 'গোত্রান্তর' আজ যুগসত্য। আর জীবনের ক্ষেত্রে যে সত্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার মতোই সমুজ্জ্বল -- নাটকে তার অপলাপ করা কোনও নাট্যকারের জীবনধর্ম হতে পারে না।"[১]

নাটকের মধ্যে গোত্রান্তর কীভাবে ঘটলো তা আলোচনা করতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষক-কন্যা গৌরী বস্তিবাসী শ্রমিক যুবক কানাইকে ভালোবাসল এবং অবশেষে তাদের বিয়ে হল -- এটাই গোত্রান্তর। কিন্তু গোত্রান্তরের আর একটি ব্যাপকতর তাৎপর্য রয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজে যে আজ সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা, ভদ্রতা ও শ্রেণি-অভিজাত্যের গোত্রবন্ধন ছিন্ন করে শ্রমিক সমাজের গোত্রভুক্ত হয়ে পড়লেন, এটাই প্রকৃত গোত্রান্তর। আর একটি গোত্রান্তর আমরা লক্ষ্য করি, গৌরী-কানাইয়ের বিয়ের দিন জমিদারের দলবল বস্তিতে আগুন দিয়ে উচ্ছেদ পর্ব শুরু করে। অসহায় বস্তিবাসীর আর্তকণ্ঠে - শৈলবুড়ীর কান্নায় আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। সেই সন্ধিক্ষণে হরেন মাস্টারের গোত্রান্তর সম্পূর্ণ হয়। বস্তির অতিথি হিসেবে নয়, শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর নেতা হিসেবেই তিনি ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন আশ্রয় নির্মাণে সঙ্ঘবদ্ধ আহ্বান জানান।

দেশ বিভাগের ফলে আমাদের সমাজে যে অভাবিত দুর্যোগ নেমে এসেছিল তা আমাদের অভ্যস্ত ও শান্তি মগ্ন জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করেছিল। পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের অসহায় দুর্গতি, লক্ষ লক্ষ লোকের বাস্তুত্যাগ -- খোলা রাস্তা, স্টেশন, প্লাটফর্ম ও বদ্ধ তাঁবুর মধ্যে অগণিত শরণার্থীর বাস্তব জীবনযাত্রা, সমাজের দৃঢ় ভিত্তি ভূমিকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল। পারিবারিক জীবনের লজ্জা, শালীনতা ধুলায় লুটিয়ে পড়েছিল। বিকৃত লালসা ও অশুভ অর্থ লিপ্সার ফাঁদ সর্বত্র। অভাবে মনুষ্যত্ব আত্মহত্যা করল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শুধু যে রাষ্ট্রীক জীবনে পরিবর্তন ঘটল তা নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যেও আমূল বিপর্যয় ঘটে গেল। যুদ্ধ, মন্বন্তর ও বাস্তুত্যাগের ফলে অর্থনৈতিক ভিত্তি একেবারে ধ্বসে গেল। নাটকে আমরা দেখি, বাস্তুত্যাগের ফলে হরেন্দ্র মাস্টারের পরিবারে নেমে এসেছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়। কিন্তু দেশে থাকতে তাদের কি না ছিল। হরেন মাস্টারের মেয়ে গৌরীর কথায়—

> "জোতজমি, খামার বাড়ি কিছুরই তো অভাব আছিল না।
>
> .....
>
> হ্যাঁ, সেইখানে তো আমরা রাজা।"[৩]

গৌরী বুঝতে পারে দেশভাগ আর দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জীবনে 'গোত্রান্তর' ঘটে গেছে।--

> "স্রোতের শেওলার মত এইখানে এক মাস, ওইখানে দুই মাস -- যারে কয় এক্কেরে গরিব দুঃখীর জীবন।"[৪]

দেশ-গাঁ ছেড়ে সীমান্তের হতশ্রী ক্যাম্প। সেখান থেকে ঠাঁই-বদল, বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে কলকাতার ভাড়াবাড়িতে। কয়েকদিনের মধ্যেই ভাড়া না দেওয়ার তাড়া খেয়ে কারখানার এক কুলিবস্তিতে। একা

হরেন্দ্র মাস্টার, আমরা জানি লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার প্রতীক-প্রতিনিধি। অর্থনৈতিক সংকট ও পারিবারিক আদর্শের পরিবর্তনের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু উদ্বাস্তু সম্মান যোগ্য বৃত্তির অভাবে নানা শ্রমসাধ্য বৃত্তিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়। ফেরিওয়ালা, স্বল্পবিত্ত ব্যবসায়ী এবং কারখানার শ্রমিক প্রবৃত্তি বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে চলল। তাই বেদনা ও বঞ্চনার সঙ্গে তাদের নিত্যকার পরিচয়, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির মহিমা তারা বুঝলো, নিজেদের অধিকার আদায়ে করবার জন্য তারা সংগ্রামের পথটি খুঁজে পেল। সমাজের মধ্যে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন প্রবাহ অবসিত হয়ে জীবন অতি মাত্রায় জর্জরিত হয়ে উঠল। হরেন্দ্র মাস্টার বেগতিক দেখে লুকিয়ে ফেরি করে পুতুল, চিরুনি, মনোহারী নানা জিনিস। বলেন--

> "শহরের এক প্রান্ত থিকা আর এক প্রান্ত পর্যন্ত পায়দলের উপুরেই আছি।"[৫]

হরেন্দ্র মাস্টারের কাছে অবশ্য লড়াইয়ের অন্যতর একটা মানে আছে। বলেন—

> "কইছে বলে মানুষ অবস্থার দাস; কয়তো মানষে? -- তা আমি এই এক কথা মানি না। -- শুধা মানি না নয়, যে দিন থিকা বুঝছি যে বাগে পাইলেই অবস্থা আমারে দাস বানাইব সেই দিন থিকা আমারও জেদ চাপছে যে আমিও অবস্থারে তাঁবে রাখুম।"[৬]

লড়াইটা এইখানেই। 'অবস্থার দাস' না হয়ে অবস্থাকে দাস বানাবার স্পর্ধা।

'গোত্রান্তর' নাটকের প্রথম অংকের একটি মাত্র দৃশ্যে স্পষ্ট হয় পূর্ববঙ্গের মোল্লারচক অঞ্চলের শান্তি কলোনির স্কুল শিক্ষক হরেন্দ্র মাস্টার মশাইয়ের করুণ অবস্থা, যা দেশ বিভাগের চরম পরিণতি। নিজের জমি জায়গা হারিয়ে কলোনির আশ্রিত হয়ে দিনাতিপাত, তবু সেখানে কাজ ছিল একটা প্রাইমারী স্কুলে। কিন্তু ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেল ছাত্রের অভাবে, কারণ মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। চরম দারিদ্র্য হতাশার মধ্যে যে দিনাতিপাত, কাজের অনুসন্ধানে কলকাতাবাসী ভাই কেশব নতুন আশার আলো দেখিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে। হরেন্দ্র মাস্টার তার স্ত্রী শংকরী এবং কন্যা গৌরীকে। এক অভিশাপ থেকে আর এক অভিশাপের গমনের মধ্যে প্রথম অংকের সমাপ্তি।

সমাজের যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল দেশ বিভাগের সঙ্গে, রূপান্তর ঘটেছিল শ্রেণি চরিত্রের, তার রূঢ় রূপটি কত অসুন্দর তারই প্রকাশ দ্বিতীয় অংকের একটি মাত্র দৃশ্যে। কলকাতার অপরিসর ছোট বাসা বাড়িতে বাড়িওয়ালার দারোয়ানের হুমকি, অস্থায়ী চাকরি থেকে কেশবের বরখাস্ত, সবশেষে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয় রাস্তায়। সেখান থেকে বস্তিতে গমন। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সংকট কিভাবে ঘুরপাক খেতে খেতে এক আদর্শহীন সমাজের গায়ে দলিতমথিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় তার করুণ রূপ ব্যক্ত হয়েছে। উদ্বাস্তু স্কুল শিক্ষক যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে, মধ্যবিত্ত প্রতিবেশী যুবক, সংঘ সম্পাদক, উকিলবাবু বা মি: লাহিড়ী স্বভাবসুলভ আচরণ করলেও আশ্রয় দিতে নারাজ, তখন বস্তিবাসীনী শৈলী, তার ছেলে কানাই এগিয়ে আসে আশ্রয়দানে। শৈলী বলে—

> "ছি ছি ছি ছি, ছি ছি ছি ছি --- ভদ্দর লোকের সর্বনাশ ভদ্দর আদমী কি এইভাবে করে? ছি ছি ছি ছি! ----- চুপ করো মা, চুপ করো। কিচ্ছু ভয় নেই, কোনও ভয় নেই। (শঙ্করীকে) দুঃখীর কোনও জাত নেই মা। আমরা সব দুঃখী। আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে তো? তবে আমরা তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেব না, এটা ঠিক! (কানাইকে লক্ষ করে) আরে কইরে, তো নে চল উঠা। (হাঁক দেয়) আরে

> এ—ে —ে—ে—ে--ই কিষ্ট মমতাজ বিল্লু সব গেলি কোথায় রে ভোঁদা! আ যা বেটা, জলদি আ যা।”[৭]

শঙ্করীর এই আশ্বাস ঠাট্টার চোখে দেখে হরেন্দ্র মাস্টার। কিন্তু সত্যিই বস্তির মানুষ ভালোবেসে ফেলে হরেন্দ্রর পরিবারকে। মধ্যবিত্তের অবশিষ্ট অভিমানটুকু ত্যাগ করে বস্তিবাসী হন হরেন্দ্র মাস্টার। হরেন্দ্র মাস্টারের পরিবারের মতো হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার পূর্ব বাংলার নিশ্চিত জীবন ত্যাগ করে এপার বাংলায় এসে বস্তিবাসীর জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হন। বাধ্য হন মধ্যবিত্তের জীবন ত্যাগ করে নিম্নবিত্তের জীবন গ্রহণ করতে।

তৃতীয় অংকে হরেন্দ্র মাস্টারের শুরু হয় নতুন জীবন। ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করে শুরু করে ফেরিওয়ালার কাজ। কিন্তু বস্তি জীবনে মাঝে মাঝে নানা উৎপাত আসে। বস্তি উচ্ছেদ করার পরিকল্পনায় আসেন ছোট বাবু। লালসার লোলজিহ্বা তার। হরিধন আসে লোভী ভামিনীর সাহায্যে কন্যা গৌরীকে ফুসলে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায়। বস্তির মধ্যে শুরু হয় মার-দাঙ্গা, মাথা ফাটে কানাইয়ের। হরেন্দ্র মাস্টার এগিয়ে আসেন বুক চিতিয়ে, চিৎকার করে বলেন—

> “আসিস, একবার দেইখ্যা যাস যেন পেয়ারাবাগান বস্তির যোশ। আসিস !”[৮]

নিরীহ হরেন্দ্র মাস্টারের এই যে বুক চিতিয়ে লড়াইইয়ের আহ্বান, এই পাঠ শৈলীবুড়ি হরেন্দ্র মাস্টারকে শিখিয়েছেন। শৈলীবুড়ি হরেন্দ্রকে বলেছে—

> “এ উৎপাত তো আছেই বাবা। ডান হাত দিয়ে ভাত খাবেন আর বাঁ হাত দিয়ে মশামাছির মতো এই সব উৎপাত তাড়াবেন। কী আর করবেন? বাঁচতে তো হবে!”[৯]

বাঁচার লড়াইয়ে শ্রমিক জীবনের দুঃখ-দারিদ্র-নীচতা-উদ্যম ---- সব মিলিয়ে তার পূর্ণাঙ্গ চালচিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যান হরেন্দ্র মাস্টার।

কত লোক যায়, আসে। মাথা গোঁজে, আবার নতুনতর ঠিকানা খুঁজে নেয়। ভালোবাসে কে? নোংরা নরক ওই বস্তুটাকে? --- মাস্টার কিন্তু আশ্চর্যভাবে ভালোবেসে ফেলেন ওই বস্তিবাসী মজুরদের --- যারা ভালোবাসা না পেতে পেতে নিজেদেরই ভালবাসতে ভুলেই গেছে ! শুধু তাই না নগণ্য ওই মানুষগুলোকে ভালোবেসেই হরেন্দ্র মাস্টার দৈবাৎ লাভ করে মানবতার নতুন পাঠ। রোজকার লাঠালাঠি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ভাঙচুর, হৈ - চৈ দেখে বস্তি ছেড়ে চলে যেতে বদ্ধপরিকর মাস্টার গিন্নি বলেই বসে, ‘আউ ছি! এইখানে আবার মানুষ থাকে?’ গিন্নির মুখে এমন কথা শুনে মাস্টারের কণ্ঠে শোনা যায় তীব্র প্রতিবাদ-- মানুষ বলবো কাকে? --- বনেদি ঘোষবাড়ির অকাল কুষ্মাণ্ড ছোটবাবু --- সেই বড় ভালো মানুষ। কিন্তু মাস্টারের মেয়ে গৌরীর অসম্মান দেখে, প্রতিবাদে যে মানুষ ডাণ্ডায় শয়তানের মাথা ফাটিয়ে আসল, তারা কোনো মানুষ --- মাইনষেতা নাই? একজন খোঁজে ভদ্র ঠিকানার মায়াবী সোনার হরিণের নাগাল — সেই অনুসন্ধানেই তার বেঁচে থাকা। আর মাস্টার বস্তির মানুষগুলোকে ভালোবেসে ভাবে—

> “ভাগ্যে এই বস্তির অমানুষগুলোর আওতায় ছিল, তাই রক্ষা পাইছিল সেদিন মাইয়া!”[১০]

মানুষ-অমানুষের হেঁয়ালিতে মাস্টার খুঁজে পায় বাঁচার নতুন শক্তি। হারিয়ে বা তলিয়ে যেতে যেতেও খুঁজে পায় ‘মানুষ’ শব্দের নতুনতর সংজ্ঞা। পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে এপার বাংলায় চলে আসা মানুষদের এপার

বাংলার কিছু মানুষ, রাজনৈতিক নেতারা পছন্দ না করলেও বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ বাস্তু ত্যাগী মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

সেই ঝড়-ঝঞ্ঝার ভয়ঙ্কর দুর্দিনেও গৌরী ভালোবেসে ফেলে কানাইকে। আর কানাই গৌরীকে। মাস্টারের মেয়ে আর কারখানার মজুর। ইতিমধ্যে কোর্টের রায় বেরিয়েছে, উঠে যাবে বস্তি। পরোয়ানা টাঙিয়ে যায় মালিকের লোক সদলবলে এসে। মাস্টার গিন্নি স্থির প্রতিজ্ঞ--

> "আইজ কিন্তু আস্তানা একটা স্থির কইরাই ফিরবা। এইখানে আর একমুহূর্ত না।"[১১]

চরমতম দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছিল যারা, পথ থেকে তুলে এনে দিয়েছিল ভালোবাসার ঠিকানা -- তাদের দুঃসময়ে, তাদেরই ছেড়ে যাওয়ার আত্মময়তা! মনে পড়ে শৈলীর কথা। সে কিন্তু বলেই ছিল, ভদ্রজনা ছেড়ে যেতে জানে। আর দুঃখী-নিঃসহায় বস্তির আধপেটা খাওয়া মানুষগুলো দল-বেঁধে দুঃখ কষ্ট ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে পারে। স্ত্রীর স্বার্থপরের মত পিঠ-বাঁচাতে চাওয়া দেখে ব্যথিত হরেন্দ্র বিভ্রান্ত হয়। স্ত্রীকে বলেন--

> "তুমি তো আমার দেশের স্ত্রী, আমার দেশেরই মা জননী। -- তোমাকে কিন্তু আমি আমার দুর্দিনে খুঁইজা পাইলাম না।"[১২]

বৃদ্ধ হরেন্দ্র মাস্টার নতুন উদ্যমে বস্তির ছেলেগুলোকে বই পড়ানোর কাজে মেতে ওঠেন। হরেন্দ্র মাস্টারের উদ্যমকে বেশ ভালো ভাবেই নেয় বস্তির মানুষজন। বস্তিবাসীনী শৈলী বলে--

> "দেখে শুনে যা বুঝি -- জ্ঞানীগুণী না হোক আমাদের ছেলেপুলে, লেখাপড়া শিখে চোখ কানটা তো অন্তত খুলতে পারবে? যুগই যখন পড়েছে লেখাপড়ার।"[১৩]

আর বস্তিবাসী কুঞ্জলাল বলে—

> "এখন আমার কথা হচ্ছে যে, একটু পড়ালিখা শিখলে নিজের বিষয়টা তো একটু হুঁশ করে নিতে পারবে?"[১৪]

হরেন্দ্র নতুন সিলেবাস তৈরি করেন পড়াশোনার জন্য। ছাত্রদের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী পড়তে বলেন। বলেন---

> "... না, খবরদার না ------ আমরা ক-তে কলাগাছ কমু না, খ-তে খরগোস বলব না! আমরা বলব ক-তে কলকারখানা, খ-তে খেতখামার, গ-তে গান্ধীরাজা, ঘ-তে ঘর ঘর ভাই, ঙ-তে উয়াং চুয়াং, চ-তে চল বাড় চল, ছ-তে ছোলাছাতু..."[১৫]

অনেকেরই ধারণা পূর্ব বাংলা থেকে এপার বাংলায় মানুষ তার দারিদ্রতা নিয়ে এসেছে। কিন্তু বাস্তবিকই তা নয়, পূর্ব বাংলার মানুষ তার নিশ্চিত জীবন, ক্ষেত, খামার, গোলা ভরা ধান সব ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, একমাত্র ধর্মীয় কারণে।

তৃতীয় দৃশ্যে কানাইয়ের সঙ্গে গৌরীর এক অস্পষ্ট প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ভামিনীর দুর্বুদ্ধিতে শঙ্করী কন্যা গৌরীকে পাঠায় ছোটবাবুর কাছে। চতুর্থ দৃশ্যে হরেন্দ্র মাস্টার কানাইয়ের সঙ্গে গৌরীর প্রেমের সম্পর্কটি বুঝে ফেলেন। তিনি বলেন—

> "আমার বাঁধা এক সংস্কার। কিন্তু ন্যায়তঃ ধর্মতঃ যেটা সত্য, তারে আমি অস্বীকার করতে পারুম না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভগবান সাক্ষী ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আমি না কইতে পারুম না। ঠিক আছে। এ বিয়া হইব। এ বিয়া হইব।"[১৬]

আসলে টিকে থাকাটাই চ্যালেঞ্জ যেখানে--- শ্রেণি, গোত্র, পেশা সব সেখানে অর্থহীন কিছু শব্দের বুদবুদ মাত্র। হরেন্দ্র মাস্টার বুঝেছিলেন, তিনি যখন বাসা বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তখন আর কেউ নয়, বস্তিবাসিনী শৈলী ও তার ছেলে কানাই তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, বিপদের দিনে যে মানুষগুলি তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, তারাই তার প্রকৃত বান্ধব।

বেজে ওঠে মাঙ্গলিক সানাই। আলোকমালায়, শোভাযাত্রায়, জোকারে পুকারে জমে ওঠে বিয়ের আসর। আনন্দময় সেই আলো হঠাৎই ঢাকা পড়ে 'দুর্বৃত্তের দাপটে'। গুণ্ডা-লেঠেল আক্রমণ করে বস্তি, উৎখাত করার জন্য। উৎসবের প্রাণ প্রেতরাত্রির কোলে চমকে চমকে ওঠে। তবু রাত কাটে মাঙ্গলিক উৎসবে - আনন্দে। ভোরের আলোয় দেখা যায়, ভেঙ্গেচুরে তছনছ হয়েছে বস্তি। তবু 'প্রতিরোধ বজ্রকঠিন'। লাঠির ঘা এইবার রক্তাক্ত করে না আর সদ্য বিবাহিত কানাইকে। প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন স্বয়ং হরেন মাস্টার। রক্ত ঝরে লাঠির ঘায়ে কপাল ফেটে। বাসি বিয়ের সকাল লাল হয়ে যায় সিঁদুরে - রক্তে। আর্তনাদ করে উঠেছিল শৈলী। ---

> "মাস্টার! মাস্টার! এ কী হল মাস্টার! এ আমার কী হল মাস্টার! সব যে ভেঙে গেল মাস্টার। ..... আমার সাধ--সোহাগের ছেলে, বউ, ঘর-গেরস্তি, আমার বস্তি।"[১৭]

আর হরেন্দ্র মাস্টারের কানে বিয়ে বাড়ির বাদ্য বাজনা হয়ে যেন বাজতে থাকে লাঠির ঘা, কান্না, আর্তনাদ। হরেন্দ্র উন্মত্তের মত বলে ওঠেন—

> "...বিয়া গেছে কাইল, আইজ গেল বাসি বিয়া। কোন রাজার বেটার বিয়াতে এত ঘটা হইছে কইতে পারো বুড়ি? ---- এত বাজনা, এত বাদ্য।"[১৮]

ভাঙ্গন নয়। মেনে নেওয়া নয়। ছেড়ে দিয়ে, শ্যাওলা হয়ে নতুন বাসার খোঁজে অনির্দেশ্য ভেসে বেড়ানো আত্মকেন্দ্রিকতাও নয়। হরেন মাস্টারের ডাক একালের লড়াকু বিশ্বকর্মাদের—

> "হেই বিশ্বকর্মার পুতের দল, চুপচাপ খারাইয়া আছস, হাত লাগাইতে পারস না তরা? হাত চালাও, কাম কর, উঠাও বস্তি।"[১৯]

হেঁইয়ো হোর মধ্যে দিয়ে সমবেত কণ্ঠে ওঠে জীবনের জয়গান। ছেলে গড়ার কাজ ছিল যার, সে আজ বস্তি - সংগঠনের বিশ্বকর্মা। 'গোত্রান্তর' বিষণ্ন করে না হরেন্দ্র মাস্টারকে। বরং গোত্রান্তরিত হয়েই তিনি খুঁজে পান প্রতিরোধের নতুন ভাষা। লড়াই আর সংগঠনের নতুন প্রেরণা। জীবনের মানে। নাটকের 'গোত্রান্তর' সম্পর্কে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন—

> "নাটকের মধ্যে এই গোত্রান্তর কিভাবে ঘটল তাহা আলোচনা করিতে গেলে বলিতে হয়, মধ্যবিত্ত শিক্ষক-কন্যা গৌরী বস্তিবাসী শ্রমিক যুবক কানাইকে ভালোবাসিল এবং অবশেষে উহাদের বিবাহ হইল — ইহাই গোত্রান্তর। কিন্তু গোত্রান্তরের আর একটি ব্যাপকতর তাৎপর্য রহিয়াছে। মধ্যবিত্ত সমাজ যে আজ সমস্ত শিক্ষাদিক্ষা, ভদ্রতা ও শ্রেণী-আভিজাত্যের গোত্রবন্ধন ছিন্ন করিয়া কায়িক

পরিশ্রম জীবী শ্রমিক সমাজের গোত্রভুক্ত হইয়া পড়িতেছে, ইহাই প্রকৃত গোত্রান্তর।"[২০]

'গোত্রান্তর' নাটকের মূল বক্তব্য --- নাটকের নামকরণের যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে — শিক্ষা ও আভিজাত্যের অভিমান বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজের কুলীন ও অকুলীনের, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সমগোত্র প্রতিষ্ঠা। নাটকের মর্মবাণীর বিস্তারের প্রয়োজনে এতে যে কয়েকটি ঘটনা সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে একটি শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের ব্যর্থতা ও বিলোপ। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রেণী বৈষম্য ও এক ভাবী সমাজ বিপ্লবের পূর্বাভাস।

তথ্যসূত্র :

১) ভট্টাচার্য , নবারুণ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, সম্পাদিত, *বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, গোত্রান্তর, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ- এপ্রিল ২০১৬ (বাং বৈশাখ ১৪২৩), পৃষ্ঠা: ৩৪৪।
২) ঘোষ, ড. অজিতকুমার, '*বাংলা নাটকের ইতিহাস*', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮ (বাং আশ্বিন ১৪২৫), পৃষ্ঠা: ৩৮০।
৩) ভট্টাচার্য, নবারুণ ও বন্দ্যোপাধ্যায় , শমীক সম্পাদিত, *বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, গোত্রান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ- এপ্রিল ২০১৬ (বাং বৈশাখ ১৪২৩), পৃষ্ঠা: ৩৮৮।
৪) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৮৮।
৫) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯২।
৬) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৮০।
৭) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৭৭।
৮) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯২।
৯) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯২।
১০) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯৪।
১১) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯২।
১২) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৮৫।
১৩) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৮৬।
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৮৬।
১৫) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯৮।
১৬) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯৮।
১৭) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯৮।
১৮) পৃষ্ঠা: ৩৯৮।
১৯) ঘোষ, ড. অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮ (বাং আশ্বিন ১৪২৫), পৃষ্ঠা: ৩৭৮।